OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 219 - 226
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 219 - 226
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

হর্ষ দত্তের গল্প : মধ্যবিত্তের স্বর ও সংকট

সীমন্তিনী সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: simontinisaha3@gmail.com
0009-0009-9266-2805

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
আশির দশক, মধ্যবিত্ত, শ্রেণি সংকট, সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক দ্বন্দ্ব, পারিবারিক ভাঙন, স্বার্থপরতা, মানবিকতা, অর্থনৈতিক সংকট, আত্মদ্বন্দ্ব।

Abstract

বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র স্বর হিসেবে আবির্ভূত হন হর্ষ দত্ত। সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি গল্পকার হিসেবে গড়ে তোলেন নিজস্ব ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি। প্রচলিত কাহিনিনির্ভর ধারাকে অস্বীকার না করেও তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্গত সংকট, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক অবক্ষয়কে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'কামাদি কুসুম সকলে' (১৯৮৪ খ্রি.) থেকেই এই প্রবণতার সূচনা লক্ষ করা যায়, যেখানে পারিবারিক সম্পর্কের অন্তর্গত স্বার্থপরতা ও মানবিকতার অবক্ষয় উন্মোচিত হয়েছে। হর্ষ দত্তের নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের আলোচনার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটচিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'কামাদি কুসুম সকলে' গল্পে মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাকে কেন্দ্র করে সন্তানের স্বার্থান্ধ মানসিকতা এবং একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের পরিণতি ফুটে উঠেছে। এখানে পরিবার শুধু জৈবিক সম্পর্ক নয়, বরং সামাজিক মূল্যবোধের প্রতীক— যার অবক্ষয় বৃহত্তর সমাজের নৈতিক পতনের দ্যোতক। আবার 'ঋণী' গল্পে ব্যক্তিমানুষের নৈতিক দায়বোধ ও বাস্তব জীবনের চাপের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। অভিজ্ঞান ও শিলাজিতের চরিত্রের মধ্য দিয়ে কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ববোধ এবং প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থার টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। এখানে অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও মানবিক মূল্যবোধের সংঘর্ষ মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করে। অন্যদিকে 'দীঘায় ভোর' গল্পে প্রবীরের চরিত্রের মাধ্যমে দমিত আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক বাধ্যবাধকতা এবং মানবিক উত্তরণের দিকটি চিত্রিত হয়েছে। যৌনতা ও নৈতিকতার দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েও লেখক মানবিকতার পুনরাবিষ্কার ঘটান। একই সঙ্গে জয়ার চরিত্র মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকট ও প্রান্তিক জীবনের নির্মম বাস্তবতাকে সামনে আনে। 'জোৎস্নাবাড়ি' গল্পে দারিদ্র্যপীড়িত তিন বোনের জীবনচিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের পতন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে অভাব শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং অস্তিত্বগত সংকটের প্রতীক। হর্ষ দত্ত মধ্যবিত্ত জীবনের বহুমাত্রিক সংকট— অর্থনৈতিক, নৈতিক ও মানসিক— গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে যেমন অবক্ষয়ের চিত্র রয়েছে, তেমনি রয়েছে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 219 - 226
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মানবিকতার সম্ভাবনাও। ফলে তিনি আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত মানসচেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

Discussion

সময়টা আশির দশক। 'আনন্দলোক' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে বর্তমান সাহিত্য জগতের সর্বক্ষেত্রে মেধাবী বিচরণ যাঁর, তিনি জনপ্রিয় কথাকার শ্রী হর্ষ দত্ত। না, শুধুমাত্র লেখক হিসাবে নয়, একজন সুচিন্তক এবং সম্পাদক রূপে তিনি অবদান রেখে চলেছেন বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে একুশ শতকের সাম্প্রতিক সময়েও। হর্ষ দত্ত আটের দশকে কথাসাহিত্যে শব্দ এবং গল্প নির্মাণের চেনা ছকের পরিচিত প্রবণতায় গা না ভাসিয়ে লিখতে শুরু করেন। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক রূপে তিনি যতটা উজ্জ্বল, ঠিক ততটাই উজ্জ্বল 'দেশ'এর কৃতী লেখক রূপে। লেখক হিসাবে তিনি চালিয়েছেন অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেই নিরীক্ষনের সুবর্ণ ফসল 'কামাদি কুসুম সকলে' গল্পটি। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। লিখেছেন সাধু ভাষায়। লেখক নিজেই বলেছেন—

> "বলতে গেলে, সেই সময় থেকেই বাংলা ছোটগল্পের বিচিত্র ও বৈভবপূর্ণ জগতে আমার বৃহত্তর আত্মপ্রকাশ। এর আগে যা কিছু লিখেছি তার সবটাই প্রস্তুতি পর্ব।"[১]

হর্ষ দত্ত'র সাহিত্য রচনার সূচনা যদিও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ কালেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর প্রাপ্ত হয়ে, আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে সাংবাদিকতার কর্মে যুক্ত হওয়ার পর পরই পাকাপাকিভাবে সাহিত্য জগতে বিচরণ শুরু করেন। তবে কিশোরবেলা, যৌবনকাল ও বেড়ে ওঠা যে তাঁর গল্পকার হয়ে ওঠার বীজক্ষেত্র, একথা বলাই যায়। হর্ষ দত্তর জন্ম ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কলকাতা শহরে। তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ময়ূরাক্ষী, তুমি দিলে', 'ও শিমুল, ও পলাশ', 'অগ্নিবৃষ্টি' ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি রচনা করেছেন অজস্র ছোটগল্প। এই সাহিত্য সাধনা তাঁকে এনে দিয়েছে 'সমরেশ বসু সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৯২ খ্রি.), 'বিচয়ন পুরস্কার' (১৯৯৬ খ্রি.), 'নিবেদিতা পুরস্কার' (২০০০ খ্রি.), 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মৃতি পুরস্কার' (২০০১ খ্রি.) ইত্যাদি।

হর্ষ দত্ত যে সময় লিখতে আসছেন সেই সময় সম্পর্কে সমালোচকরা মনে করছেন—

> "মধ্যসত্তরের পর থেকে বাংলা ছোটগল্প আবার ক্রমশ কাহিনীমুখী হয়ে উঠল। যদিও প্রতীক-রীতি কারো কারো রচনায় উপেক্ষিত হল না অথবা রূপকধর্মিতা বজায় রাখলেন কোনো কোনো গল্পকার কিন্তু মূলধারাটি রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতি, সমরেশ বসু, বিমল কর প্রমুখের কাহিনী নির্ভরতার স্রোতটিকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হতে থাকল।"[২]

হর্ষ দত্ত এই যুগ প্রবণতাকে বহন করেও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন নিজ বৈশিষ্ট্যে। লেখকের জন্ম ও বড় হওয়া শহর কলকাতায়। নগরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক অভিঘাত তাঁর কৈশোর ও যৌবনের পথে ছাপ ফেলবে সেটাই স্বাভাবিক। যা পরবর্তীকালে তার লেখায় ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছ। মধ্যবিত্ত পরিসরে শহরকেন্দ্রিক জীবনে হর্ষ দত্ত খুব কাছ থেকে দেখেছেন মানুষের বদলে যাওয়াকে, চিনেছেন 'দিনবদলে রঙ-বদল'এর রোজনামাচাকে, উপলব্ধি করেছেন 'বদলাতে না চেয়েও বদলাতে থাকা সত্তার খাবি খেয়ে টিকে থাকার যাপননামা'কে। ষাট-সত্তর দশকের এক অনিশ্চিত সময়ে স্কুল-কলেজের একফালি আলপথের সজীব জীবনে হেঁটেছেন; আর হাঁটতে হাঁটতে গায়ে মেখে নিয়েছেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নাবালক দেশের টলমল রক্তাক্ত পায়ের চিহ্ন। একফালি সজীব আলের আশে-পাশে লুটিয়ে থাকা মন্বন্তরের উচ্ছিষ্ট পণ্য আর অভাবের নিগূঢ় আড়াল লেখককে গড়ে দিয়েছে যুক্তিবাদী-চিন্তাশীল রূপে। ভারত-চীন সংঘর্ষ, উত্তাল খাদ্য আন্দোলন, ভারত-পাক যুদ্ধ, নকশালবাড়ি আন্দোলন, দেশীয় সাম্যবাদী দলে ভাঙন, কংগ্রেসের পতন, যুক্তফ্রন্টের শাসনভার গ্রহণ, সাম্যবাদী মত ও পথের সংঘর্ষে তিন ও তারও বেশি কট্টরপন্থী দলের আবির্ভাব, জরুরি অবস্থা, শিখ দাঙ্গা এ সবই তো টাটকা ইতিহাস। সেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই লেখকের চিন্তন ধারলো হয়েছে। লেখক নিজেকে সেঁকে নিয়েছেন গর্জনশীল সত্তরের অনিবার্য কালখণ্ডে। সেই সঙ্গে শুনছেন বিশ্বায়নের পদধ্বনি, প্রযুক্তি ও আধুনিকতার হাতছানি। সেই জন্যই –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 219 - 226
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আশি-নব্বই-এর দশকে রচিত ও প্রকাশিত তরুণ গল্পকারদের রচনায় অবধারিতভাবে সত্তর দশকের পরিবেশ-ভাবনা, মত ও পথের সংঘর্ষ-নির্ভর তাৎপর্য, নতুন দেশভাবনা, বিপ্লব ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদী স্বভাবের সমর্থনে অনুসৃত হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। সময় শিল্পকে অবশ্যই শিক্ষা দেয়, শিক্ষিত করে, প্রেরণা দেয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে নিয়ে আসে। এভাবেই এই সময়ের সচেতনা গল্পকারদের সুস্থ প্রবণতার অনুপন্থী। কিন্তু গল্পকারগণ এমন আরও কিছু বিষয় নিয়েছেন, যেগুলি সময়েরই নির্দেশ।"[৩]

এই ভিন্ন ধারার প্রতিবাদী উচ্চারণে নিজস্ব পথ তৈরি করলেন হর্ষ দত্ত। তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্যর মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে যা দাগ কাটে তা মধ্যবিত্তের জীবন সংকট। এই প্রবন্ধে লেখকের বিশেষ কয়েকটি গল্পে সেই সংকটের প্রতিরূপ কীভাবে উন্মোচিত হয়েছে তা আলোচনা করা হবে।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'কামাদি কুসুম সকলে' গল্পটি। আলোচনার সূচনা তাঁর প্রথম গল্পটি দিয়েই হওয়া একান্ত জরুরী শুধুমাত্র তাঁর লেখা প্রথম গল্প বলেই নয়। বরং এই গল্পটি যে হর্ষ দত্তের সামগ্রিক গাল্পিক সত্তার মৌল প্রবণতা ও তার সাক্ষ্য বহন করে তা উপলব্ধি করা। সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের জীবনযাত্রায় আলো-ঝলমলে হীরকখণ্ডের মধ্যে যে বিষাক্ত-দ্যুতি লুকিয়ে আছে, তারই দ্যোতনা যেন লেখক দেখিয়েছেন তাঁর এই গল্পে। মানব-মনের ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর এবং ধ্বংসাত্মক ইতিবৃত্ত যেন গোটা গল্প জুড়ে বুনেছেন লেখক। হর্ষ দত্ত তাঁর লেখায় বারবার দেখাতে চেয়েছেন দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রতিচ্ছবি, যা আলোচ্য গল্পেও বর্তমান। গল্পের শুরুতে গল্পকার দেখান মৃত্যুশয্যায় এক নারী। নাম কৃষ্ণকামিনী দেবী। তিনি ভাগ্যবতীই! কারণ কী? কারণ নাকি, তার চারপাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ঘিরে আছে তার সন্তানেরা। যারা সকলেই কৃষ্ণ-কামিনীর আপনজন শুধু নয়, নাড়ী ছেঁড়া আলোর ধন। স্বামী বিনোদচন্দ্রের পৌরুষের মান রক্ষা করতে গিয়ে সতেরো থেকে বত্রিশ বছর পর্যন্ত কৃষ্ণকামিনী যাদের বিইয়েছেন, তারাই আজ মায়ের 'শেষকৃত্য উদযাপনে'র জন্যে এসে দাঁড়িয়েছে একই পঙক্তিতে। লেখকের উদ্দেশ্যও তাই, মৃতপ্রায় মাতার শয্যার পাশে প্রাপ্তবয়স্ক সামাজিক বা বৈবাহিক সূত্রে প্রতিষ্ঠিত সন্তানাদির অবস্থান ও অভিমুখ ঠিক কোন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে তা পাঠকসমীপে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তিনি। পাঁচের দশকের একান্নবর্তী পারিবারিক ভাঙনের যে অভিঘাত তা আটের দশকের উত্তাল সময়ে এসে ঠেকেছে স্নেহ-ভালোবাসাহীন স্বার্থের অন্ধ একাকীত্বে। আর এই একা বাঁচার, একা থাকার, একক প্রাপ্তির নির্লজ্জ আস্ফালনই 'মাতৃশ্রাদ্ধে'র আয়োজন করে। এই গল্পে উচ্চারিত মা শুধু জন্মদাত্রী মা নয়; এই মা আমাদের আজন্ম লালন-কর্ত্রী সমাজিক মা, যে আমাদের চৈতন্যকে জাগ্রত করেছে, লালন করেছে, গড়ে তুলেছে। তারই গর্ভজাত সন্তানেরা দলগত কিংবা ব্যক্তিগত আখের গোছাতে দু হাত-পা তুলে নেমে পরেছে প্রতিযোগিতায়। আলোচ্য গল্পে, সেই মায়ের শেষশয্যায় গেঁথে যাচ্ছে এক একটি পেরেক, উপর থেকে দেখে যাকে ফুল-মালা ইত্যাদি বলে ভ্রম হয়! তবুও কি সব আশা শেষ! এই পৃথিবী, এই সমাজ কিংবা বিনোদচন্দ্র-কৃষ্ণকামিনীর ফেলে যাওয়া পরিবার কি সত্যিই নিঃশব্দে হয়ে উঠবে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রভূমি? নাকি কোথাও কিছু রয়ে যাবে বাকি? কিছু ফুল, কিছু মন ও কিছু মানুষ থেকে যাবে এই পৃথিবীতে-সংসারে-সমাজে ভালোবাসার অর্ঘ্য নিয়ে? রমার মতো যারা লোভ-লালসার আগুনে পুড়তে দেবেনা মানুষের স্বাভাবিক মানবিক গুণাবলিকে; যারা স্বার্থের চৌহদ্দি টপকে হেঁটে যাবে অবক্ষয়হীন এক সামাজিক দায়ের উত্তরসূরী হয়ে। নাকি এই পৃথিবী শুধুই আঁকবে সামাজিক অবক্ষয়ের, নষ্ট মননের, অন্ধকার ভবিষ্যতের চিত্রত রূপ? এই প্রশ্নের মধ্যেই পাঠককে দাঁড় করিয়ে নষ্টচেতনাকে শান দিতে চেয়েছেন গল্পকার।

পরবর্তী একটি গল্প 'ঋণী'তে এই অবক্ষয়িত চেতনার বহিঃপ্রকাশ যে শুধু পারিবারিক ক্ষেত্রে নয় গোটা সমাজের সমস্ত সম্পর্কের মধ্যেই বিরাজমান তা স্পষ্ট করে। দুটি সদ্য তরুণ চরিত্র এবং তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, বিবেকের দংশন ও তা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা। অভিজ্ঞান ও শিলাজিৎ দুজনেই স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে সরকারি সার্ভেন্ট হয়। না, চাকরি ক্ষেত্রে এরা কেউই কারও প্রতিদ্বন্দ্বী বা বন্ধু নয়। তাহলে এদের এক পঙক্তিতে দাঁড় করাল কে? একজন সিনিয়র সহকর্মীর কাছে অভিজ্ঞতা ও সহচর্যের ঋণে আর একজন পিতৃঋণে জড়িয়ে আছে শ্যামাপ্রসাদের কাছে। প্রথম জীবনে বেসরকারি অফিসে কাজে ঢুকে নাজেহাল অভিজ্ঞানকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন যিনি, তিনি অফিসের সিনিয়র শ্যামাপ্রসাদ। পরবর্তীতে অবসরপ্রাপ্ত শ্যামাপ্রসাদের ছেলে শিলাজিৎ অভিজ্ঞানের নতুন অফিসে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 219 - 226
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জয়েন করে অন্য ডিপার্টমেন্টে। জীবন সংগ্রামের জন্য, জীবিকার প্রয়োজনে নিম্ন মধ্যবিত্ত দুই তরুনকেই খুঁজতে হয়েছে চাকরি যা আশির দশকের এক স্বাভাবিক চিত্র। কিন্তু পরিবর্তন আসছে কোথায়? ক্রমশ বাণিজ্যিক মুনাফার বাজারে কথা রাখার দায় কারও নেই। শ্যামাপ্রসাদের পুরোনো কোম্পানির সাহেবরা তাকে আশ্বাস দেয় শিলাজিৎ'কে তারা কাজে নেবে। কিন্তু তা একেবারেই সত্য নয়, বরং স্পষ্টতই কোম্পানির এতোদিনের 'এফিসিয়েন্ট' কর্মী হিসেবে কোনোরকম প্রিভিলেজড পাবে না শ্যামাপ্রসাদের ছেলে শিলাজিৎ। বাবার ফেলে আসা অফিসে ব্যাকডোর দিয়ে চাকরি হবে না তাঁর। আসলে প্রতোযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে কোনো কাজের জন্য অতিরিক্ত মূল্য প্রদানের যে প্রচলিত রীতি তা ভাঙতে শুরু করেছে; সে কোনো প্রতিষ্ঠানেই হোক কিংবা মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরেই হোক। শিলাজিৎ বলেছে—

> "যুগ পাল্টে গেছে অভিদা। ... বাবার ভরসায় আমি বসে থাকিনি। ওখানকার দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ... আমি নিজেকে এইসব কমপিটিটিভ একজাম গুলোর জন্য তৈরি করতে শুরু করি।"[৪]

না, কোনো রাগ বা অভিযোগ নেই শিলাজিৎ'র এই চাকরি না পাওয়ার জন্য বরং সে প্রস্তুত জীবনযুদ্ধে লড়ে প্রমাণ দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। কার্তিক লাহিড়ী 'সময় মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা' (পরিচয়, শারদীয়, ১৯৯৫) গল্পে পুত্রের চাকুরিরত পিতাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আত্মহত্যা করতে বলার যে নৃশংসতা, শুধুমাত্র চাকরিটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার লোভে তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানেই আমরা পাই শিলাজিৎ'কে। আসলে সংকট ও তার উত্তরণ-পথ খোঁজা দুই ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার লেখকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন।

এ তো গেল জীবিকা অন্বেষণের পথে নেমে ওঠাপড়া ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত। কিন্তু ব্যক্তিমানুষ নিজের মনের সাথেই নেমেছে দ্বান্দ্বিকতার মল্লযুদ্ধে। 'ঋণী' গল্পের অভিজ্ঞান নিজের জীবনে 'শ্যামাদার' কাছ থেকে যে মানসিক সহচর্য পেয়েছে তার ঋণ স্বীকার করে। তাই যখন শিলাজিৎ বলে— "আপনাকে আমার চেয়েও বাবা বেশি ভালোবাসে,"[৫] তখন আবেগাপ্লুত অভিজ্ঞান যেন তীব্র আবেগে বারবার পৌঁছে যেতে চেয়েছে বয়স্ক অসুস্থ শ্যামাদার কাছে। শিলাজিৎ বুক বেঁধেছে আশায়, কারণ বৃদ্ধ পিতার কাছে অভিজ্ঞানকে নিয়ে গেলে একটু খুশির লেশ পৌঁছে দিয়ে পুত্রের দায়িত্ব পালন করতে পারবে সে। শুধু তাই নয় শিলাজিৎ যে তার বাবার মনের অবস্থা সম্পর্কে ভাবিত সেই বার্তাও যেন পৌঁছে যাবে বাবার প্রিয়পাত্র অভিজ্ঞানকে উপস্থিত করাতে পারলে। তবে শুধুই কী দায়িত্ব পালনের দায়ভার নাকি আরও কিছু? হয়তো জীবনের শেষ পর্যায়ে সঙ্গীহীন পিতার মুখে সে দেখেছে অসহায়তা-দৌর্বল্য, যে একদিন প্রাইভেট কোম্পানির হেডক্লার্ক হয়ে স্বজন পরিবেষ্টিত ছিল, তাকে আজ বার্ধক্য ঠেলে দিয়েছে একাকীত্বের অন্ধকারে। বয়সজনিত অসুস্থতা থেকে মুক্তি না দিতে পারুক অন্তত একমুঠো মানসিক শান্তিও যদি খোলা হাওয়ার মতো পৌঁছে দিতে পারে বাবার কাছে, তাই বা কম কিসে! কিন্তু অভিজ্ঞান বা শিলাজিৎ এর এই চাওয়া কী সত্যিই পূরণ হয়? না হয় না। কারণ একদিকে রয়েছে কৃতজ্ঞতাবোধ অন্যদিকে রয়েছে সাংসারিক দায় ও দায়িত্ব, যাকে উপেক্ষা করা সহজ নয়। স্ত্রী কিঙ্কিণীর নিজের আগতপ্রায় সন্তানের আল্ট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্ট দেখতে চাওয়ার আবদার উপেক্ষা করে সময় বার করে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছোনো শ্যামাদার জন্য শিলাজিৎ'র সাথে যাওয়া সম্ভব হয় না অভিজ্ঞানের। ঠিক হয়তো এ কারণেই পি জি হাসপাতালের এক ডাক্তার শিলাজিৎ'কে জানিয়ে দেয়—

> "আপনার বাবা যে-বেডটা দখল করে রাখবেন, সেটা কোনও তরুণ কিংবা মাঝবয়সী মানুষের পক্ষে আরও জরুরি।"[৬]

কিন্তু অভিজ্ঞান চায় কৃতজ্ঞতার ভার ক্ষানিকটা লাঘব করতে। সময়-সহচর্য দিতে না পারুক যদি কিছু টাকা সে শ্যামাদার চিকিৎসায় তুলে দিতে পারে! সমস্ত রকম মধ্যবিত্ত হিসেব কষে নিয়ে সে টাকার পরিমাণ ঠিক করে ফেলে, হাজার খানেক। কিন্তু শিলাজিৎ টাকা নিতে অস্বীকার করে তার সেই সহজ ঋণ শোধের রাস্তায় কাঁকড় বিছিয়ে দেয়।

> "নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট গাছের মতো ঝলসে গেল অভিজ্ঞানের সমস্ত সত্তা।"[৭]

তার এই চমক আসলে মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী মানসিকতাকে নাড়িয়ে দেয়। প্রশ্ন ওঠে কৃতজ্ঞতার দাম অর্থের মূল্যে চুকিয়ে দেওয়া যায় কি? অভিজ্ঞানেরও যেন জ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে, নিজের চারিত্রিক স্খলনে সে নিজেই যেন বিস্মিত হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 219 - 226
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই গল্পে স্বার্থপরতা-দায়হীনতার সচিত্র আস্ফালন নেই বরং আছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আদর্শগত নৈতিক গুণাবলির সাথে অবক্ষয়িত সময়ের যে দ্বান্দ্বিক টানাপোড়েন তার প্রয়োগ। তবে আশির দশকে এই দ্বন্দ্ব শুধু যে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটেছে তা নয়। সরকারি চাকরি'তে যোগ দিলেই আরাম মিলবে আর বেসরকারি চাকরি জীবনে আছে চরম খাটুনি— এই প্রবণতা যেন স্পষ্ট করে তোলে স্বাধীন দেশের মানুষের দেশের প্রতি ঔদাসীন্য কতখানি গভীরে পৌঁছেছে। এই দায়হীন নির্লিপ্ত দেশসেবকরা আসলে কর্মক্ষেত্রে কেবল চাকর হয়ে থেকে গেছে, হয়ে উঠতে পারেনি দেশের সম্পদ। আগের দশকে শিক্ষিত মেধাবী তরুণদের নকশাল আন্দোলনে যোগ দেওয়া, সমাজ পরিবর্তনের ডাক দেওয়া এমনকি বাংলায় রাজ্য ক্ষমতা বদলের পরিস্থিতিতে যে অস্থির সময়ের চিত্র সাহিত্যে উঠে এসেছে। হর্ষ দত্ত সেই সময়-মানসের আত্মদর্শনের যে সংকট তাকেই স্পষ্টতা দিতে চেয়েছেন তার গল্পে—

> "মানুষ ক্রমশ হয় আত্মমুখ— অনেকটা আত্মহননেন মতো। জরুরি অবস্থা উঠে গেলেও রাজনৈতিক 'টারময়েল', একাধিক 'ক্রশ কারেন্টে', ভয়, আবেগহীনতা, ক্লান্তি, অবসাদে এই ষাটের দশকের শেষ থেকে গড়িয়ে আসা গোটা সত্তরের দশক ছিল এক অভিনব যুদ্ধভূমি, যুদ্ধক্লান্ত এক কুরুক্ষেত্র। ... আশির ও নব্বই-এর দশকের সদ্য লিখতে বসা গল্পকাররা কতটা এই সত্তরের দশকের নানান বিশ্বাসের ভাঙনের দলিল-লেখক হতে পেরেছেন!"[৮]

আগের দশকগুলির সংকটের অভিঘাত থেকে গেছে পরবর্তী দশকে, বদলে দিয়েছে মানুষের অন্তঃবিশ্বের মানচিত্র। তাই হয়তো সমালোচক বলেন—

> "সেই বদলানো সময়ের অন্তঃশীল স্বভাবের প্রসঙ্গ-যা বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে বিশিষ্ট হতে থাকে। আসলে আশি আর নব্বই-এর দশকের যে গল্প, তার জন্ম-যোগ এই সময়ের নাভিতন্ত্রেই।"[৯]

'দীঘায় ভোর' এই লেখকের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। আটত্রিশ বছরের যুবক প্রবীর এক অফিসের কেরানী। একান্ত নিজেরই জন্য কোনো সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে, কারণ উল্টোডাঙার সি আই টি কোয়ার্টারে দেড়খনা ঘরে রিটায়ার্ড বৃদ্ধ বাবা, মা ও অবিবাহিত দুই বোনকে নিয়ে তার বাস। মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি ঝুলে থাকা গালে চড় মারতে মারতে মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে আগুন; 'অবদমিত কামনা-বাসনা, আশা-আকাক্ষার আগুন। কিন্তু উপায় কী? সংসার-সমাজ তাকে শিখিয়েছে নিজের পৌরুষের উজ্জ্বলতা বজায় রেখে দায়িত্বের বর্ম পরে ক্রমাগত নিজেকে বিসর্জন দিতে দিতে, 'ভালো-ভদ্র-সুশীল' ছেলে হয়ে থাকার অভিনয় করে যেতে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবিবাহিত জীবন কাটাতে। তবে প্রবীরের এক্কেবারে বিপরীত চরিত্র তারই কলিগ রতন দাস। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তার সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। দীঘায় 'ভাড়া করা মেয়ে' নিয়ে প্রবীরকে ঘুরতে যাবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে দিয়ে রতন দাস বলে—

> "যদি জানাজানি হয়ে যায়, লোকে হয়তো নিন্দে করবে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তোর সমস্যা নিয়ে কে ভেবেছে যে তুই নিন্দে নিয়ে মাথা ঘমাবি! ... কীভাবে, কেমন করে বাঁচবি সেটা সম্পূর্ণ তোর হাতে।"[১০]

আশি-নব্বই দশকে এসে জীবনের এই দ্বিমুখী উন্মোচন খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের দুজন তরুনের মধ্যে জীবনের বোধের যোজন ফারাক। রতন দাসের সৌজন্যে তিনশো টাকার বিনিময়ে, লুকিয়ে দেহজীবী জয়া'কে নিয়ে দীঘায় পৌঁছায় প্রবীর। কিন্তু নারীশরীর ভোগ করা হয়না তার। কিন্তু কেন? কারণ জয়া সেখানে গিয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পরে। তবুও পেটের দায়ে, তিনশো টাকা ঘরে নিয়ে যাবার আশায়, ব্যবসার পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে প্রবীরকে সে ভোগ করতে বলে তার শরীর। আর তখনই সে খদ্দের প্রবীর নয়, মানুষ প্রবীরের পরিচয় পায় কিংবা বলা যায় সেই মুহূর্তেই প্রবীর হয়ে ওঠে খদ্দের থেকে একটি রক্তমাংসের ব্যক্তিমানুষ। সেই নতুন পরিচয়ে, অসুস্থতার দৌর্বল্যে "ঠিক তখনই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জয়া। পাথর-চাপা জল যেমন বাধামুক্ত হয়ে শব্দ করে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, তেমনভাবে জয়ার কান্না প্রবল তীব্রতায় ছড়িয়ে পড়ছে। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে জড়ানো গলায় জয়া বলল, ওগো, আমাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যেও না। তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে এভাবে ফেলে রেখে...। প্রবীর আর দূরে সরে থাকতে পারল না। কাছে এসে জয়ার উত্তপ্ত কপালে হাত রেখে বলল, আঃ, কেঁদো না। আমি আছি...।"[১১] নিজের সম্মান বাঁচাতেই হয়তো

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 219 - 226
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রবীর সারারাত জেগে জলপট্টি দিয়ে জয়াকে সুস্থ করে তুলে বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল। কিন্তু গল্পের শেষে এসে পাঠক উপলব্ধি করে প্রবীরের আত্ম উপলব্ধির গভীরতা—

> "আমার এই হাত তোমাকে নোংরা করেনি। সুস্থ করেছে। ... প্রবীরের চোখের সামনে এখন ভোরের আলো একটু একটু করে পাপড়ি মেলেছে। আর আঁধারের ভয় নেই।"[১২]

আসলে প্রবীর কখনোই চায়নি নিজের সুস্থ স্বাভাবিক চারিত্রিক অবস্থান থেকে সরে এসে নিজের চোখে নিজেই নেমে যেতে। আবার লিবিডো চেতনার তাড়না, দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে ক্রমাগত হারতে থাকা, ব্যর্থ জীবনের গ্লানি তাকে লুব্ধ করে তোলে। তাই পদস্খলন ঘটে যায় তবে উত্তরণের রাস্তাও সে খুঁজে পায়। না, এখানে পদস্খলন বলতে চারিত্রিক স্খলনের কথা বলা হচ্ছে না বরং বলা হচ্ছে নিজস্ব জীবন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে দেখার কথা, যা তাকে শিকড়চ্যুত করত। এই গল্পে একদিকে প্রবীর সাধ থাকলেও সাধ্য নেই বলে গুছিয়ে নিতে পারে না সুখী গৃহকোণ। অন্যদিকে জয়া পরিবারের পেটে ভাত জোগাতে, নিজের প্রতি ঘৃণা নিয়ে বাধ্য হয় শরীর বেচতে। তার সংলাপেই স্পষ্ট হয় আক্ষেপ—

> "দাদা, ও দাদা, তুই আমারে আর মারিস না রে। এই দ্যাখ, আমার ব্যাগ এক্কেয়ারে শূইন্য। আইজ একটা পয়সাও কামাই নাই। ...তরে কোথাইকা দিমু বল তো। মা, বলো, দাদারে বলো ... আমি বেশ্যা হইয়া গেছি মা ... বুড়ি, বুন আমার, তুমি কি নিবা কও...।"[১৩]

এই অপাংক্তেও জীবনেও জয়া সন্তরণ করে। হোক না জ্বরের ঘোরে, তবু তারও আছে কোনো স্বপ্নের মানুষ, সেও আশ্রয় খোঁজে ভালোবাসায়। 'বিনয়দা' বলে কাতর স্বরে বারংবার সম্বোধন করায় পাঠক বোঝে হয়তো সেই একমাত্র প্রেমিক পুরুষ যে কোনোদিন খদ্দের হয়ে ওঠেনি জয়ার কাছে। এই গল্পের প্রেক্ষাপট আলোচনার প্রসঙ্গে একথা বলাই যায়—

> "আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক থেকে মূল্যবোধের সংকটের বিপর্যয় ও ক্ষয়ের রূপ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। আর্থ-সামাজিক, মানবিক এবং শ্রেণীসচেতনতা থেকে উদ্ভূত ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকটে ব্যক্তি গভীর যন্ত্রণায় আবর্তিত হচ্ছে, বিভ্রান্ত বিমূঢ় মানুষ মূল্যচেতনার সংকটে নিদারুণ বিপন্ন হয়েছে, সমস্ত মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে, শুধু নিঃস্ব মানুষের সার্বিক ব্যর্থতা আর গ্লানির চিত্রই উন্মোচিত হয়েছে।
>
> অন্যদিকে এই গ্লানিময় অন্ধকার থেকে মুক্তি চাইছে মানুষ, এই মুক্তি আসছে কখনও সোচ্চার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী মূল্যচেতনার গল্পে, কোথাও তা সামান্য হলেও ব্যক্তিসত্তার উত্তরণের মধ্যে, আবার কোথাও সত্তার গহনে ব্যক্তির মৌলিক মূল্যসন্ধানের মধ্য দিয়ে, যেখানে সত্তার গভীরে অন্বেষণের মধ্য দিয়ে মানুষ যথার্থ মানবিক মূল্যকে খুঁজছে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের গভীর অন্ধকারের অন্তরাল থেকে পথ খুঁজে বেরিয়ে আসতে চাইছে আধুনিক মানুষ।"[১৪]

জীবনের ওঠাপড়ায় রাষ্ট্রনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষিত যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে যা মানুষের জীবনকে আন্দোলিত করে তা হল অর্থনৈতিক অবস্থান। যশোধরা রায়চৌধুরী আশির দশকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন—

> "পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে, দুর্ভিক্ষের যৌথ স্মৃতি বহন করে বাঙালি। আশির দশকে দিল্লি গিয়ে বিদেশ মনে হয়েছিল। সেখানে গাড়ির ড্রাইভার যে ধরনের জামাকাপড় পরে থাকে, লক্ষ্য করেছিলাম আমার পুরুষসঙ্গী বাঙালি উচ্চশিক্ষিত যুবক তার চেয়ে ঢের সস্তা জামা পরে আছে।"[১৫]

মধ্যবিত্তের শিক্ষিত বাঙালির এই অবস্থান খুব স্পষ্ট। বিশেষত এক শ্রেণির বাঙালি যারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাড়ির অধিকারী, আজ তারা নিঃস্ব, সম্বল বলতে ওই বাড়িটুকুই। আভিজাত্যের পাহাড় ডিঙিয়ে নামা হয়নি ঘর্মময় কর্মময়তায়, যাদের প্রতিবেশীরাও দেখেছে দূর থেকে। তাদের ঘিরে ঘনীভূত হয়েছে রহস্যের নীল ছবি। আবার ঘটনাচক্রে যদি তারা লিঙ্গ পরিচয়ে হয় মহিলা, তাহলে রোমাঞ্চের গন্ধ আরও প্রগাঢ় হয়।

'জোৎস্নাবাড়ি' গল্পটি ঠিক এরকম একটি গল্প। যারা বাস করে এক নেই'-এর সাম্রাজ্যে। এই নেই'-এর ঘেরাটোপ তাদের করেছে রহস্যময়। সুরতিয়া নদীর ধারের একাকী দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়ির ভিতরে যে একাকীত্ব, নির্জনতা,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 219 - 226
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দারিদ্র্যতার বিবর্ণতা ঠিক কতখানি সে হদিশ গল্পে ততটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি যতটা গুরুত্ব পেয়েছে জীবনমুখী হতে চেয়েও হতে না পারা তিনটি মেয়ের নিঃস্ব অবয়ব। লিলি-মিলি-নিলি বছরের পর বছর যারা প্রায় একই রকম কিশোরী অথবা সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত বয়েসে আটকে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচাতে। কিন্তু কাকে বলে সম্ভ্রম! বরং এই আড়লে থেকে যাওয়া তাদেরকে করে তোলে আরও আরও আকর্ষনীয়, যেন কোনো নিষিদ্ধ জগতের পরী! প্রতিবেশী যুবকের কল্পনায় তাদের শরীর ভরে ওঠে—

> "মিলিদির পরনে কোনও শাড়ি ছিল না। ওর ফিগার, দুটো বুক, পেট— আঃ! কেমন দেখতে বল! ... খুব সুন্দর টসটসে তাই না।"[১৬]

এ এক আদিম উল্লাস। নাগালে না পাওয়ার ক্ষোভ যেন মিটিয়ে নেওয়া চলে কথা সূচে। যেখানে একদিন ছিল সুখ তার নাগাল পাওয়া যেত না সেখানে আজকের রিক্ততা যে খুব সাদামাটা হতে পারে এই বিশ্বাস কারও হয় না। তাই একটাও শাড়ি না থাকার গল্পে মেয়েগুলির দেহকে যেন কামুক পশুর খাদ্য করে তুলেছে, চাইলেই যাদের ওপর ঝাঁপিয়ে আঁচড়ে-কামড়ে লুটেপুটে নেওয়া যায়।

স্পষ্টতই উপলব্ধ হয় যে বাড়ির গায়ে খোদিত আছে 'সোনার তরী'র মতো উচ্চমার্গের নাম সে বাড়ির জীবনযাপনের মধ্যে ছিল শৌখিনতার রেশ, একদিন হয়তো সেখানেও ছিল পূর্ণতার গান যা পরবর্তীতে অর্থনৈতিক অভাবের ফেরে হারাতে হারাতে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে হারিয়ে গেছে সবই। এখন তাদের একমাত্র নির্ভর কলকাতা থেকে আসা বিমলানন্দ সেনের পাঠানো মাত্র দেড়শ টাকার মানি অর্ডার। আর সেই টাকাকে ঘিরে তিনবোনের তিনরকম অভিব্যক্তি—

> "লিলিদিদি টাকাটা নেয়। ধীরে গোনে, তারপর চোখের জল ফেলতে শুরু করে। ... মিলিদিদি থমথমে মুখে এসে দাঁড়ায় ... টাকা গুলো নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। ... নিলি বলে আমার সোনার দুল এ মাসে ছাড়াতেই হবে দিদি।"[১৭]

লিলি তার ভিখারি হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ হলেও মিলি যেন অধিকার বুঝে নিতে চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল। আর নিলি বজায় রাখতে চেয়েছে শৌখিনতার শেষচিহ্ন ভুখা পেটেও। এই রিক্ত দশাও যেন কোনো রহস্যের দরজা খুলে রাখে ওই বাড়িতে পৌঁছাতে না পারা সেই মানুষগুলির সামনে যাদের আসলে প্রয়োজন নিস্তরঙ্গ জীবনে একটু আরাম আমোদ। তাই কখনো যৌন উস্কানি আবার কখনো আগত মানি অর্ডারের প্রেরকের রহস্য সন্ধানের মধ্যে রসস্থ সম্পর্কের হদিশ খোঁজা। মধ্যবিত্তের যন্ত্রণা দরদ দিয়ে নির্মাণ করতে গিয়ে লেখক তাঁর কলুষিত মানসিক অবস্থানের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে ভুলে যাননি। তাই বীরেন্দ্র দত্ত যথার্থই বলেছেন—

> "হর্ষ দত্ত আর এক প্রতিষ্ঠিত গল্পকার যিনি এই সময়ের প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত জীবনের স্বভাবে, ব্যক্তির মনের কথাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর গল্পে।"[১৮]

সুতরাং বর্তমান সময়ের মধ্যবিত্ত জনমানসের প্রতিবিম্ব অঙ্কনে এবং মধ্যবিত্তের স্বর ও সংকটের নির্মাণে তিনি যে অগ্রগন্য একথা মানতেই হয়।

Reference:

১. দত্ত, হর্ষ, বাছাই গল্প হর্ষ দত্ত, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ ই এপ্রিল ২০০২, পৃ. ভূমিকাংশ।
২. দাশগুপ্ত, মঞ্জুষ, প্রবন্ধসংগ্রহ ১, অরুণাংশু ভট্টাচার্য ও সত্যসাধন দাস (সম্পাদনা), সাহিত্য রংবেরং পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০৭, পৃ. ২৩৭
৩. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৫, পঞ্চম সংস্করণ জুলাই ২০০৪, পৃ. ৬২৮
৪. দত্ত, হর্ষ, বাছাই গল্প হর্ষ দত্ত, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ ই এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৯৪
৫. তদেব
৬. তদেব, পৃ. ৯৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 219 - 226
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৭. তদেব, পৃ. ৯৯
৮. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৫, পঞ্চম সংস্করণ জুলাই ২০০৪, পৃ. ৬২০
৯. তদেব, পৃ. ৬১৯
১০. দত্ত, হর্ষ, বাছাই গল্প হর্ষ দত্ত, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ ই এপ্রিল ২০০২, পৃ. ১৫
১১. তদেব, পৃ. ১৬৫
১২. তদেব, পৃ. ১৬৮
১৩. তদেব, পৃ. ১৬৬
১৪. চক্রবর্তী, সাবিত্রী নন্দ, আধুনিক বাংলা ছোটোগল্প মূল্যবোধের সংকট, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃ. ২৩৬
১৫. রায়চৌধুরী, যশোধরা, ‘নতুন বাঙালি কি সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবিচ্যুত?’, আধুনিক বাঙালির আধুনিকতা, শিবাশিস দত্ত (সম্পাদনা), তবুও প্রয়াস প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৫০
১৬. দত্ত, হর্ষ, বাছাই গল্প হর্ষ দত্ত, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ ই এপ্রিল ২০০২, পৃ. ১৪৯
১৭. তদেব, পৃ. ১৫০-৫১
১৮. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮৫, পঞ্চম সংস্করণ জুলাই ২০০৪, পৃ. ৬৩৯